ম্যালেরিয়া [Malaria]

সূচনা (Introduction) : ম্যালেরিয়া একপ্রকারের প্রোটোজোয়া আক্রান্ত কমিউনিকেবল রোগ। আমাদের দেশে এই রোগটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই রোগ নির্মূলের জন্য বিভিন্ন সরকারি পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও রোগ নির্মূলকরণে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছি। 'Bad air' অর্থাৎ, দূষিত বায়ু থেকে malaria শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। **Laveran** 1880 খ্রিস্টাব্দে মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়া পরজীবী শনাক্ত করেন এবং **Ronald Ross** 1897 খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা এই রোগ বিস্তার করে।

ম্যালেরিয়ার প্রকার এবং তাদের প্যাথোজেন (Types of Malaria with their Pathogen) :

ম্যালেরিয়ার নাম (Names of Malaria)	প্যাথোজেন (Pathogen)
1. Benign Tertian Malaria	*Plasmodium vivax*
2. Malignant Tertian Malaria	*Plasmodium falciparum*
3. Quartan Malaria	*Plasmodium malariae*
4. Mild Tertian Malaria	*Plasmodium ovale*

ভেক্টর (Vector) : স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা *(Anopheles culicifucies)*।

ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) : 10-37 দিন। *P. Vivax*-14 দিন, *P. falciparum*-12 দিন। *P. malarae*-28 দিন এবং *P. ovale*-14 দিন।

রোগ বিস্তার (Transmission of disease) : স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা যখন ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীর রক্তপান করে তখন ম্যালেরিয়া পরজীবী মশকীর দেহে প্রবেশ করে। ম্যালেরিয়া পরজীবীর গ্যামেটোসাইট দশা (gametocyte stage) মশকীর দেহে প্রবেশ এবং উক্ত দশা থেকে স্পোরোজয়েট (sporozoite) দশা সৃষ্টি হয়। স্পোরোজয়েটগুলি মশকীর লালাগ্রন্থিতে অবস্থান করে। উক্ত মশকীটি যখন সুস্থ মানুষের রক্তপান করে তখন স্পোরোজয়েট দশাগুলি সুস্থ লোকের রক্তে মিশে যায়। আক্রান্ত ব্যক্তির যকৃতে স্পোরোজয়েট দশা থেকে মেরোজয়েট (merozoite) দশা সৃষ্টি হয়। মেরোজয়েট যখন রক্তে মুক্ত হয় তখন যে টক্সিন (toxin) নিঃসৃত হয় তা থেকে রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। অর্থাৎ, লোকটি ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হয়।

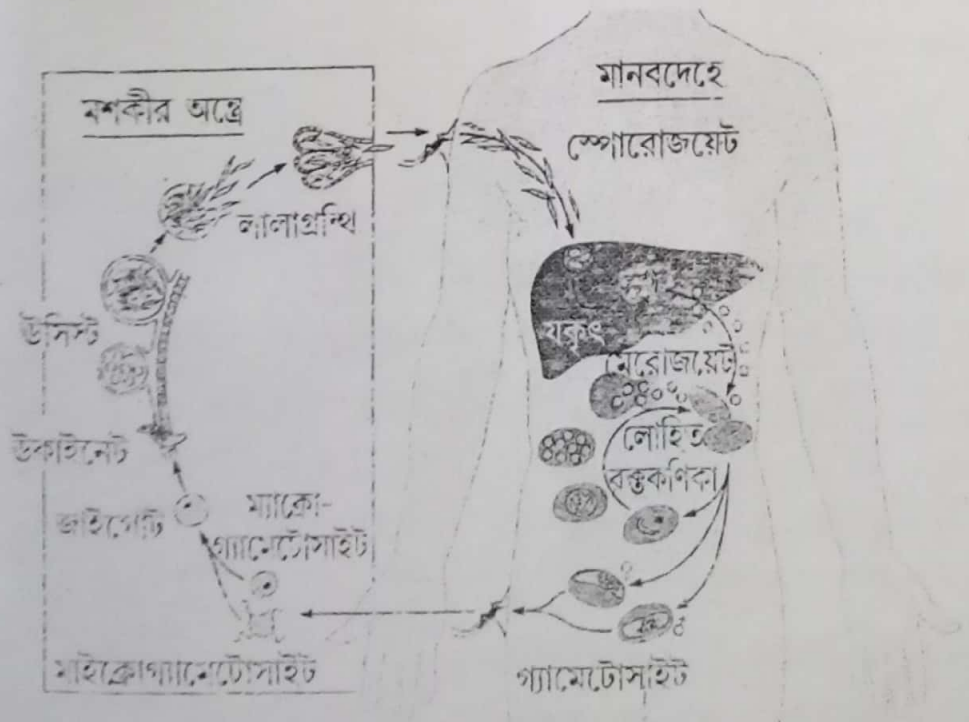

চিত্র 2.7 ম্যালেরিয়া পরজীবীর বিভিন্ন দশা

Scanned with CamScanner

রোগলক্ষণ (Symptoms) :

① ম্যালেরিয়া রোগের তিনটি দশা দেখা যায়, যেমন—(i) **শীত দশা** (cold stage) : এই দশায় রোগীর ভীষণ কাঁপুনি দেখা যায়, যা 20 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টা স্থায়ী হয়। (ii) **উত্তাপ দশা** (Hot stage) : এই দশায় রোগীর উচ্চ তাপমাত্রা (105°F-106°F) দেখা যায়। এটি 2-4 ঘণ্টা স্থায়ী হয়। (iii) **ঘর্ম দশা** (Sweating stage) : এই সময় রোগীর প্রচুর ঘাম হয় এবং জ্বর বেড়ে যায়। এই দশাটি 2-3 ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

② জ্বরের সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, গা-বমি বমি এবং পেশির যন্ত্রণা থাকে।

③ রোগী ক্রমশ দুর্বল ও রক্তশূন্য হয়ে পড়ে।

নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে ম্যালেরিয়া দমন করা যেতে পারে—

রোগ দমন (Prevention and Control of Disease) :

আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা : যেহেতু ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী থেকে মশার মাধ্যমে রোগজীবাণু সুস্থ লোকের দেহে ছড়ায় তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা শুরু করা দরকার। **কেমোথেরাপির** সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ হল **কুইনাইন** (Quinine)। কুইনাইন সেবন করিয়ে ম্যালেরিয়া রোগজীবাণুদের বিনাশ করা হয়। **কেমোকুইন** (Chemoquine), **ক্লোরোকুইন** (Chloroquine), **প্রাইমাকুইন** (Primaquine), **প্লাসমোকুইন** (Plasmoquine) ইত্যাদি ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। এ ছাড়া **পাইরিমেথামাইন** (Pyrimethamine) এবং **মেপাক্রিন** (Mepacrine) জাতীয় ট্যাবলেটও ম্যালেরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া চিকিৎসার পূর্বে রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে রোগটি ম্যালেরিয়া কিনা। ওষুধের ডোজ ও মাত্রা সঠিক না হলে রোগ জটিল আকার ধারণ করতে পারে। ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলে কোনো ওষুধ সেবনের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তারবাবু ওষুধের ডোজ ও সেবন পদ্ধতি ঠিক করে দেবেন।

রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা : (i) রোগাক্রান্ত এলাকায় প্রত্যেককে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী ওষুধ (কুইনাইন) সেবন করতে হবে। তাহলে বাহকের মাধ্যমে রোগজীবাণু রক্তে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে। (ii) মশার কামড়ের হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এর জন্য মশারি খাটিয়ে শয়ন, গায়ে ওডোমস ক্রিম মাখা বা মশা তাড়ানোর ধূপ ব্যবহার করতে হবে।

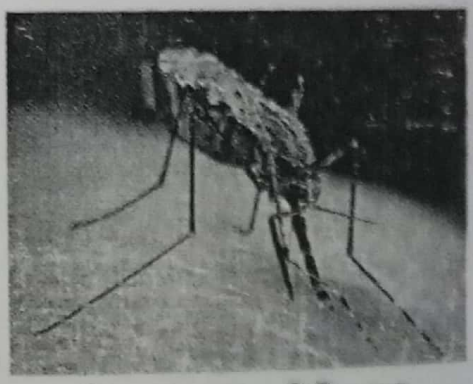

চিত্র 2.8 অ্যানোফিলিস মশা

রোগজীবাণু বাহকদের বিনাশ করা : যেহেতু মশা (স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা) ম্যালেরিয়া পরজীবীর বাহক তাই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য মশা দমন একান্ত প্রয়োজন। মশা দমনের উপায়গুলি হল—(i) বাড়ির আশপাশ আবর্জনা মুক্ত রাখা। (ii) খানাখন্দ বুজিয়ে ফেলা যাতে জল জমতে না পারে। (iii) খোলা পাত্রে জল জমতে না দেওয়া। (iv) নালানর্দমা পরিষ্কার ও স্রোতযুক্ত রাখা। (v) মশার লার্ভা ও পিউপা দশা ধ্বংস করার জন্য প্রজননস্থলে তেল ঢেলে দেওয়া বা কীটনাশক স্প্রে করা। (vi) পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংস করার জন্য DDT, BHC ইত্যাদি স্প্রে করা।

রোগনির্ণয় (Diagnosis) : রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া পরজীবী পাওয়া গেলে ম্যালেরিয়া রোগ নির্বাচন করা যায়। এ ছাড়া **ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট** (Immunochromatographic test) এবং **ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট** (Microscopic test) করে রোগ নির্বাচন করা হয়।

AIDS—Acquired Immune Deficiency Syndrome

প্যাথোজেন (Pathogen) : HIV অর্থাৎ, **Human Immunodeficiency Virus**।

ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) : 10–12 বছর।

HIV ভাইরাসের গঠন (Structure of HIV) : এই ভাইরাস সাধারণত গোলাকার হয় এবং আয়তনে 90–120 nm হয়। ভাইরাসের কেন্দ্রে দুটি সদৃশ RNA এবং **রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ** (reverse trans-

Scanned with CamScanner

criptase) উৎসেচক থাকে। ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডকে বেষ্টন করে দ্বিস্তরী আবরক থাকে, যাকে **নিউক্লিও ক্যাপসিড** (nucleo capsid) বলে। এই ক্যাপসিড প্রোটিন ও লাইপো প্রোটিন স্তর দিয়ে গঠিত।

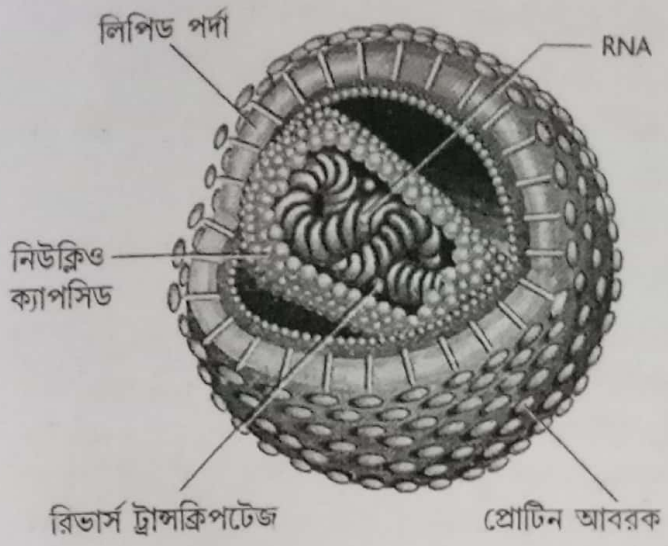

চিত্র 2.9 HIV-এর গঠন

ক্যাপসিডের বাইরের দিকে গ্লাইকো প্রোটিনের স্পাইক (Spike) থাকে। স্পাইকগুলি প্লাজমা পর্দার সঙ্গে হেল্পার T cell দিয়ে সংযুক্ত থাকে।

রোগ সংক্রমণ (Mode of Transmission) : এই রোগ যেভাবে সংক্রামিত হয় তা হল—(i) HIV সংক্রামিত রোগীর সঙ্গে অবাধ যৌন সংসর্গ, (ii) HIV Positive রক্ত গ্রহণ, (iii) রোগীর ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, ব্লেড, রেজার ইত্যাদি ব্যবহার করা, (iv) মায়ের দেহ থেকে প্লাসেন্টার মাধ্যমে শিশুর দেহে ভাইরাসের সংক্রমণ।

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : (i) ফ্লু-এর লক্ষণ, যেমন—জ্বর, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, নাক দিয়ে সর্দি ক্ষরণ ইত্যাদি। (ii) যকৃতের সংক্রমণ থেকে জন্ডিস, বমি-বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য। (iii) লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ এবং গ্রন্থি স্ফীতকায় হয়। অনুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পায়। (iv) ইমিউনিটি পাওয়ার ভেঙে পড়ে ফলে সহজেই নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

HIV সংক্রমণের প্রভাব (Effect of HIV infection) : AIDS আক্রান্ত রোগীদের সামান্য সংক্রমণই খুব সিরিয়াস হতে পারে এমনকি ক্যানসারও সৃষ্টি হতে পারে। AIDS আক্রমণের পর রোগী 3–4 বছরের মধ্যেই মারা যায়। যে-কোনো রোগই তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কারণ AIDS-এর কোনো সঠিক চিকিৎসা আজও আবিষ্কার হয়নি।

প্রতিকার ও রোগ দমন (Prevention and control) : যেহেতু AIDS রোগের কোনো সুচিকিৎসা নেই তাই AIDS-এর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করাই শ্রেয়। HIV সংক্রমণ রোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে—

(i) যৌনমিলন কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। (ii) অন্যত্র ক্ষেত্রে কনডোম ব্যবহার আবশ্যিক। (iii) স্টেরিলাইজড বা জীবাণু নাশক সূচ, ব্লেড, রেজর ব্যবহার করতে হবে। ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার আবশ্যিক। (iv) কেবল HIV মুক্ত রক্ত সঞ্চারণ করতে হয়। (v) নিডল, সিরিঞ্জ, ব্লেড, রেজার একবারের বেশি ব্যবহার করা চলবে না।

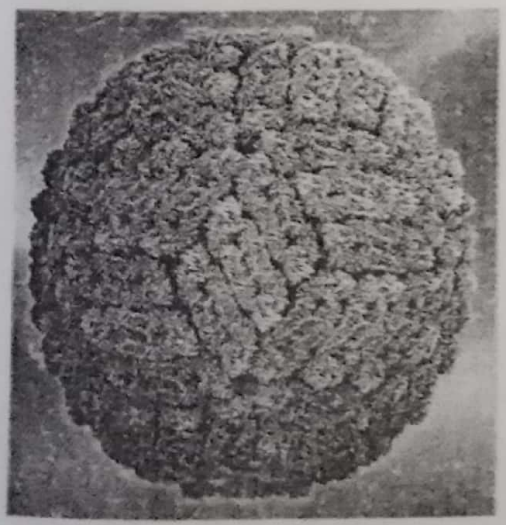

চিত্র 2.10 ডেঙ্গু ভাইরাস

3 ডেঙ্গু [Dengue]

রোগের কারণ (Causative agent) : ডেঙ্গু জ্বরের কারণ হল **ডেঙ্গু ভাইরাস** (Dengue Virus)। এই প্রকার ভাইরাস RNA জাতীয়। এই ভাইরাসের গণ (genus) হল *Flavivirus* এবং গোত্র হল—Flaviviridae।

রোগ বিস্তার (Mode of transmission) : ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক পতঙ্গ হল স্ত্রী এডিস মশা (*Aedes aegypti*)। এই মশকী যখন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর রক্তপান করে তখন ডেঙ্গু ভাইরাস মশকীর দেহে প্রবেশ করে। ভাইরাস আক্রান্ত মশকী যখন সুস্থ লোকের রক্তপান করে তখন ডেঙ্গু ভাইরাস সুস্থ লোকের রক্তে মিশে যায়। 4–5 দিন পর লোকটি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়।

Scanned with CamScanner

ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) : 4–10 দিন।

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : (i) হঠাৎ করে জ্বর আসে, সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। বিশেষ করে চোখের পিছনে। (ii) জ্বরের সঙ্গে গাঁটে গাঁটে তীব্র ব্যথা, হাড় ভেঙে যাওয়ার মতো ব্যথা করে। তাই এই জ্বরকে ব্রেক-বোন জ্বর (break bone fever) বলা হয়। (iii) ত্বকে র‍্যাশ (rash) বেরোয় বিশেষ করে পিঠে, র‍্যাশগুলি হামের মতো দেখায়। (iv) উচ্চ তাপমাত্রা (104°F – 105°F), সমস্ত পেশিতে ব্যথা, অস্থি সন্ধি ফুলে যায়, লসিকা গ্রন্থির স্ফীতি লক্ষ করা যায়, গা-বমি বমি ভাব এবং বারে বারে বমি হয়। (v) অনেক ক্ষেত্রে 2–7 দিন পর রোগী আরোগ্যের দিকে যায়। (vi) অনেক সময় রোগ হাতের বাইরে চলে যায়। মিউকাস পর্দা থেকে রক্ত ক্ষরণ শুরু হয়। পেটে তীব্র ব্যথা, অণুচক্রিকার হার কমে যায়। মুখ, নাক, কান, পায়ু ও মূত্রনালি থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। (vii) পরবর্তী 24–48 ঘণ্টা আরও ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছোয় এবং রোগীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

রোগের পর্যায় (Stages of the disease) : ডেঙ্গু জ্বরের তিনটি পর্যায় দেখা যায়, যথা—জ্বর অবস্থা; চরম অবস্থা এবং পুনরুদ্ধার দশা।

জ্বর অবস্থা (Febrile Stage) : উচ্চ তাপমাত্রার (104°F) সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা ও গাঁটে ব্যথা, গাঁট ফুলে যায়, আঙুল বেঁকে যায়। ত্বকে হামের মতো র‍্যাশ বের হয়। মিউকাস পর্দা থেকে রক্ত ক্ষরণ শুরু হয়। এই দশা 2–7 দিন পর্যন্ত চলতে থাকে।

চরম অবস্থা (Critical Stage) : দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগ চরমে ওঠে। এই সময় বুকে ও উদরগহ্বরে তরল সঞ্চিত হতে থাকে। রক্তজালকের ভেদ্যতা বেড়ে যাওয়ায় এবং রক্তজালকের প্রাচীরে সূক্ষ্ম ছিদ্র হওয়ার জন্য রক্ত সংবহন তন্ত্র থেকে জলীয় অংশ দেহ গহ্বরের বিভিন্ন স্থানে জমতে থাকে, এই দশায় বিভিন্ন অঙ্গ অকেজো হয়ে পড়ে এবং সাংঘাতিক রক্ত ক্ষরণ ঘটে। বিশেষ করে পাক-অন্ত্রীয় নালি (Gastro intestinal tract) থেকে। এই সময় **ডেঙ্গু শক সিনড্রোম** (Dengue shock syndrome) পরিলক্ষিত হয়।

পুনরুদ্ধার দশা (Recovery Stage) : এই দশায় লিকেজ তরল পুনঃশোষিত হয়ে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। জ্বর কমে যেতে থাকে। দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। ত্বকের র‍্যাশ মিলিয়ে যেতে থাকে এবং রোগী ক্রমশ আরোগ্য লাভ করে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) : নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থেকে ডেঙ্গু নিশ্চিত করা যায়। যেমন—(i) উদর ব্যথা (Abdominal pain) (ii) বমি (Vomitting) (iii) যকৃৎ বড়ো হওয়া (Liver enlargement) (iv) মিউকাস পর্দা থেকে রক্ত ক্ষরণ। (v) হিমোক্রিট ভ্যালু বেড়ে যায় এবং অণুচক্রিকার হার কমে যায়। (vi) দুর্বলতা ও অসাড়তাভাব (Lethargy) লক্ষ করা যায়।

ল্যাবরেটরি টেস্ট (Laboratory test) : নিম্নলিখিত ল্যাবরেটরি টেস্ট থেকে ডেঙ্গু জ্বর শনাক্ত করা যায়—(i) PCR পদ্ধতির সাহায্যে কোশ কর্ষণ (Cell culture) ও নিউক্লিক অ্যাসিড পৃথক্‌করণ (Nucleic acid detection)। (ii) নিউক্লিক অ্যাসিড ডিটেকশনের মাধ্যমে ভাইরাস শনাক্তকরণ করা যায়। (iii) ভাইরাল অ্যান্টিজেন ডিটেকশন (Viral antigen detection) অথবা স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি (Specific antibodies) পৃথক্‌করণ ইত্যাদির সাহায্যে ডেঙ্গু ভাইরাস (Dengue virus) পাওয়া গেলে রোগটি ডেঙ্গু বলে নির্বাচন করা হয়।

চিকিৎসা (Treatment) : ডেঙ্গু ভাইরাস মারার নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই, তাই আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করার দরকার হয়। (i) জ্বর কমানো ও গাঁটের ব্যথা কমানোর জন্য Paracetamol (দিনে 3–4 বার) গ্রহণ করা যেতে পারে। Brufen, Ibufren জাতীয় ওষুধ গ্রহণ একেবারেই উচিত নয়। (ii) শুষ্কতা (Dehydration) রোধ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জলপান ও ORS গ্রহণ। (iii) রোগীকে সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে। (iv) একসঙ্গে বেশি না খেয়ে বারে বারে পরিমাণ মতো খাবে। (v) রক্তের অণুচক্রিকার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগীকে প্লাজমা বা রক্ত দেওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে।

Scanned with CamScanner

রোগ দমন ও প্রতিকার (Control and Prevention of the Disease) : এই রোগের কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই ডেঙ্গুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। পদ্ধতিগুলি হল—(i) মশারি খাটিয়ে শয়ন, জানালা ও দরজায় Net লাগাতে হবে। (ii) বাহক পতঙ্গদের বিনাশ ঘটাতে হবে, যেমন—বাড়ির আশে-পাশে ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখা। (iii) খানাখন্দ বুজিয়ে ফেলতে হবে। কোনো পাত্রে জল জমতে দেওয়া চলবে না। (iv) ড্রেন পরিষ্কার রাখতে হবে। ড্রেনের জলে তেল দেওয়া, ইনসেক্টিসাইড স্প্রে করা দরকার। (v) মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মশা মারার গান-এর সাহায্যে ধোঁয়া ড্রেনের চারপাশে, ঝোপেঝাড়ে দিতে হবে। (vi) ঘরে মশা মারার ওষুধ স্প্রে করতে হবে। (vii) নর্দমার জলে মশার লার্ভা ভক্ষণকারী মাছ—গাপ্পি, তেচোখো, তেলাপিয়া ছেড়ে রাখতে হবে।

চিত্র 2.11 এডিস মশা

4 বসন্ত [Pox]

বসন্ত দু-রকমের, যথা—**জল বসন্ত ও গুটি বসন্ত।**

A জল বসন্ত (Chicken Pox) :

প্যাথোজেন (Pathogen) : *Varicella zoster*

ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) : 2-3 সপ্তাহ।

রোগ বিস্তার (Transmission) : এই রোগ রোগীর ব্যবহৃত জিনিস থেকে, মল-মূত্র থেকে, হাঁচি-কাশি থেকে ছড়ায়, বিশেষ করে গুটি যখন শুকিয়ে মামড়ি ওঠে তখন এই রোগের বিস্তার ঘটে।

চিত্র 2.12 জল বসন্ত

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : (i) উচ্চ তাপমাত্রার কয়েক দিন পর গুটি ওঠা শুরু হয়, (ii) প্রচণ্ড গা-হাত-পা ব্যথা করে, (iii) মাথার যন্ত্রণা হয়, (iv) গুটি যখন পাকতে শুরু করে তখন আবার উচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায়, (v) গুটির মধ্যে প্রথম দিকে জল থাকে, পরে পুঁজের আকার ধারণ করে, (vi) এরপর গুটি শুকিয়ে কালচে বর্ণ ধারণ করে এবং খোসা উঠতে থাকে।

প্রতিকার ও দমন (Prevention and control) : (i) রোগীকে মশারির মধ্যে রাখা। (ii) রোগীর জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের খোল পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে। (iii) রোগীর মল-মূত্র লোকালয় থেকে দূরে মাটির গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে। (iv) রোগীর সূচিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন। (v) গুটির মামড়ি, সর্দি, গয়ের ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (vi) শিশুর জন্মলগ্ন থেকেই Pox vaccine দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

স্থূলতা বা ওবেসিটি (Obesity) : আমাদের দেশের প্রায় চারভাগের একভাগ মানুষ অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা বা ওবেসিটির শিকার। স্থূলতা বলতে বোঝায় প্রকৃত বা আদর্শ ওজন অপেক্ষা 20 শতাংশ বেশি ওজন। স্থূলতা দেখা যায় যখন পুরুষদের শরীরে চর্বির পরিমাণ 25% বেশি হয় এবং মহিলাদের শরীরে চর্বির পরিমাণ 32% বেশি হয়। স্থূলতা নির্ণয়ের একটি প্রধান সূচক হল BMI বা Body-Mass Index। 1997 খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যপূর্ণ মহিলা ও পুরুষদের BMI-এর সীমা নির্দেশ করেছে। 30-এর বেশি BMI হলে একজন পুরুষ বা মহিলাকে স্থূলতাযুক্ত বা ওবেস বলা যায়। স্থূলতাকে কোনো রোগ না বলে রোগের লক্ষণ বলা যায়। স্থূলতার কারণে বিভিন্ন রোগ হয়, যেমন—মধুমেহ, হৃৎ-সংবহনতান্ত্রিক রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কোলন ও বুকের ক্যানসার প্রভৃতি।

চিত্র 2.6 স্থূলতা

স্থূলতার কারণ : স্থূলতা পরিলক্ষিত হয় যখন গৃহীত ক্যালোরি বা শক্তির পরিমাণ শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যয়িত শক্তি অপেক্ষা অধিক হয় এবং বাড়তি ক্যালোরি বা শক্তি শরীরে আডিপোজ (ফ্যাট) কলারূপে সঞ্চিত হয়। স্থূলতার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে অনেক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু স্থূলতা একটি কারণে হয় না। এর প্রধান কারণগুলি হল—বাড়তি ওজন, বংশগত উপাদান, হরমোনের মাত্রাগত অসাম্য, শারীরিক কার্যক্রমের অভাব, বিপাকীয় হার, খাদ্যগ্রহণ প্রণালী এবং শারীরিক ও মানসিক চাপ।

Scanned with CamScanner

স্থূলতার কুফল বা কুপ্রভাব ঃ স্থূলতার কারণে আমাদের শরীরে নানাপ্রকার শারীরবৃত্তীয়, অঙ্গসংস্থানিক ও মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। এগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) শরীরে রক্ত সংবহনের জন্য অনেক বেশিসংখ্যক রক্তনালিকার প্রয়োজন হয়।

(ii) হৃৎপিণ্ডকে অনেক বেশিবার বা জোরে সংকুচিত হতে হয়, যার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

(iii) চর্বির কারণে মধ্যচ্ছদার সঞ্চালন হ্রাস পায়, ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। ফুসফুসে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে না।

(iv) পেশি-কঙ্কালতন্ত্রের উপর বা অস্থিসন্ধির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, ফলে নানা প্রকার সমস্যা যেমন—বাত, গাঁটবাত (Gout), পেশির খিঁচুনি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে নানা প্রকার দেহভঙ্গিমাগত বিকৃতির সৃষ্টি হয়।

(v) শিশুদের ক্ষেত্রে স্থূলতার কারণে Type-I ডায়াবেটিস, হাঁপানি, লর্ডোসিস প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

(vi) দীর্ঘস্থায়ী স্থূলতার কারণে ক্যানসারের মতো রোগ সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে কোলন বা বৃহদন্ত্রের ক্যানসার ও মেয়েদের বুকের ক্যানসার উল্লেখযোগ্য।

(vii) স্থূলতা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও একাগ্রতা হ্রাস করে।

স্থূলতা দূরীকরণের উপায় (Control of obesity) ঃ

শারীরিক কার্যক্রম বা ব্যায়াম ঃ নিয়মিত পরিকল্পিত ব্যায়ামের দ্বারা শক্তি খরচ বৃদ্ধি করলে স্থূলতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ব্যায়ামের দ্বারা ওজন কমানো যায় এবং সাধারণ মানুষ দৈনিক 30 মিনিট ভারী থেকে মাঝারি পাল্লার ব্যায়াম করলে তার শরীরের চর্বি হ্রাস পায়।

গৃহীত ক্যালোরির পরিমাণ হ্রাস বা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঃ প্রতিদিন যদি 500 ক্যালোরি কম শক্তি গ্রহণ করা হয়, তবে প্রতি সপ্তাহে 0.45 গ্রাম বা 1 পাউন্ড ওজন হ্রাস করা সম্ভব। এই ওজন হ্রাসের পরিমাণ আরও বেশি করা সম্ভব গৃহীত খাদ্য বা শক্তির পরিমাণ হ্রাস করে এবং তার সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম করে, এর জন্য প্রয়োজন খাদ্যাভাসের পরিবর্তন। নিম্নলিখিত ভাবে খাদ্যাভাসের পরিবর্তন করা যায় ঃ

(i) অতিরিক্ত চর্বি বা তেল জাতীয় খাদ্য বর্জন।

(ii) নিম্ন ঘনত্বের কোলেস্টেরল (LDC) বর্জন এবং উচ্চ ঘনত্বের কোলেস্টেরল (HDC) গ্রহণ।

(iii) একবারে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ না করে বার বার কম করে খাদ্য গ্রহণ।

(iv) অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাদ্য না গ্রহণ করে শাকসবজি ও ফল বেশি করে খাওয়া।

জীবনশৈলীর পরিবর্তন ঃ দৈনন্দিন জীবনে আমরা বাড়িতে, রাস্তাঘাটে ও পেশাগতভাবে এমন অনেক কাজ করি; যার দ্বারা আমরা শক্তি ব্যয় করতে পারি। কিন্তু অনেকেই শক্তি ব্যয় না করে অকেজো ও কর্মহীন জীবন ডেকে আনে। জীবনশৈলীর পরিবর্তন দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(i) মটরযানের বদলে সাইকেল চালানো অভ্যাস করা।

(ii) সকালে ও বৈকালে হাঁটার অভ্যাস করতে হবে।

(iii) ছুটির দিনে বা সময়াবকাশে বাগান করতে হবে বা অন্যান্য পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হবে।

(iv) লিফ্‌টের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।

(v) কাজের স্থানের কিছু দূরে বাস থেকে নেমে পরতে হবে এবং বাকি পথ হেঁটে পৌঁছোতে হবে।

(vi) বিনোদনমূলক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

মধুমেহ : সাধারণভাবে ডায়াবিটিস বা মধুমেহ হল রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি জনিত রোগ। এটি বিপাকক্রিয়ার এমনই এক বিশৃঙ্খলা যেখানে দেহ কলাকোশ খাদ্যের শর্করাকে ব্যবহার করতে পারে না এবং যার ফলে ফ্যাট ও প্রোটিন বিপাক ব্যহত হয়।

সাধারণত মানুষের রক্তে প্রতি 100 মিলিলিটারে 80–100 মিলিগ্রাম গ্লুকোজ থাকে। রক্তে গ্লুকোজ বা রক্তশর্করার পরিমাণ প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 120 মিলিগ্রামের উপর বৃদ্ধি পেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **হাইপারগ্লাইসেমিয়া** বলা হয়। এরকম অবস্থায় যখন বৃক্কের গ্লুকোজ পুনঃবিশোষণের ক্ষমতা (180 গ্রাম/100 মিলি.) অতিক্রান্ত হয়, রক্তশর্করা তখন প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হতে থাকে, একে **গ্লুকোসুরিয়া** বলে। রক্তশর্করার যে অবস্থায় হাইপারগ্লাইসেমিয়া ও গ্লুকোসুরিয়া দেখা যায়, তাকে সম্মিলিতভাবে মধুমেহ বলা চলে। অগ্ন্যাশয়স্থিত ল্যাংগারহ্যানস্ আইলেটের বিটা-কোশের ক্ষতিসাধন বা স্বল্প-সক্রিয়তা থেকে দেহে

Scanned with CamScanner

ইনসুলিনের অভাব দেখা দেয়। ইনসুলিন-বিরোধী পদার্থের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পেলে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। অধুনা গ্লুকোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত-শর্করা পরিমাপ করা হয়।

ডাক্তারি শাস্ত্র অনুসারে দু-প্রকার মধুমেহ লক্ষ করা যায়, যেমন—ডায়াবেটিস্ মিলিটাস টাইপ-I এবং ডায়াবিটিস্ মিলিটাস টাইপ-2। পৃথিবী জুড়ে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রায় 90% মানুষ দ্বিতীয় প্রকার (টাইপ-2) মধুমেহতে আক্রান্ত হন। প্রথম প্রকার (টাইপ-I) মধুমেহতে সাধারণত 10% মানুষ আক্রান্ত হয়, যা জন্মগতভাবে শিশুদের বেশি লক্ষ করা যায়।

চিত্র 2.11 গ্লুকোমিটারের সাহায্যে রক্তশর্করার পরীক্ষা

বিগত 50 বছরে বিশ্বজুড়ে টাইপ-2 মধুমেহ-এর ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করা গেছে। যেখানে 1985 খ্রিস্টাব্দে এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল 30 কোটি, সেখানে 2010 খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 285 কোটি। মানুষের স্থূলতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মধুমেহতে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মধুমেহ-র ঝুঁকি ঃ মধুমেহ একজন মানুষের জীবনকাল প্রায় 10 বৎসর হ্রাস করে। এর সঙ্গে নানা প্রকার শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। এটি হৃৎপিণ্ড ঘটিত রোগ আসার সম্ভাবনা 2 থেকে 4 গুণ বৃদ্ধি করে। যার মধ্যে থাকে উচ্চ রক্তচাপ, ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক প্রভৃতি। এই রোগ দীর্ঘদিন থাকলে নিম্নঅঙ্গহানী ঘটতে পারে এবং দীর্ঘদিন হাসপাতালে কাটাতে হতে পারে। এ ছাড়া চোখ ও কিডনির ক্ষতি, অ্যালজাইমারস্ ডিজিজ, ভাসকুলার ডিমেনসিয়া, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি মধুমেহ রোগীদের সাধারণভাবেই আক্রমণ করে।

মধুমেহ হওয়ার কারণ ঃ জীবনশৈলী ও বংশগত উপাদানগুলি মিলিত ভাবে মধুমেহ হওয়ার কারণ নির্ধারণ করে। কিন্তু এর মধ্যে খাদ্যগ্রহণ, স্থূলতা প্রভৃতি উপাদানগুলি ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও বয়স, লিঙ্গ, বংশগত উপাদানগুলি মানুষের নিয়ন্ত্রাধীন থাকে না, এ ছাড়া অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব, বিপাকক্রিয়ার দুর্বলতা প্রভৃতি টাইপ-2 মধুমেহ হওয়ার কারণ হিসেবে দেখা দেয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টিগত অবস্থাও কখনো-কখনো এর জন্য দায়ী হয়। নীচে মধুমেহ হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করা হল—

1. **জীবনশৈলী ঃ** টাইপ-2 মধুমেহ মানুষের জীবনশৈলীর সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত থাকে। এর অন্যতম কারণ হল অতিরিক্ত স্থূলতা, শারীরিক শ্রমের অভাব, অনুপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, মানসিক চাপ ও শহরায়ন। দেখা যায় 60–80 মানুষের মধুমেহ হওয়ার কারণ হল দৈহিক স্থূলতা।

খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি বহুলাংশে মধুমেহ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ এবং এক-কথায় অতিরিক্ত শক্তিদায়ক খাদ্য গ্রহণ করলে মধুমেহ হতে পারে।

2. **বংশগতি ঃ** যদিও স্থূলতা ও অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণ মধুমেহ হওয়ার অন্যতম কারণ, তবুও বলা যায় মধুমেহ হওয়ার প্রকৃত কারণ মানুষের বংশগত উপাদান বা জিনের মধ্যে নিহিত থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে সমপ্রকৃতির যমজ শিশুদের একজনের মধুমেহ হলে, অপর জনের মধুমেহ হওয়ার সম্ভাবনা 90% থাকে। কিন্তু বিষমপ্রকৃতির শিশুদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা থাকে 25–50%। 2011 খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মানুষের মধ্যে প্রায় 36 রকমের এমন জিনের অস্তিত্ব পেয়েছেন, যেগুলি মধুমেহ হওয়ার জন্য দায়ী। এইরকম একটি জিনের নাম TCF7L2allele, যেটি বংশ পরম্পরায় মধুমেহ রোগ বহন করে।

3. **চিকিৎসাগত কারণ ঃ** কিছু ওষুধের প্রভাবে মানুষের শরীরে টাইপ-2 মধুমেহ দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম হল গ্লুকোকর্টিকয়েড, বিটা ব্লকার প্রভৃতি। কিছু কিছু রোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে ডায়াবিটিস টাইপ-2 হতে পারে। যেমন—অ্যাক্রোমেগালি, কোশিং পীড়া, হাইপার থাইরডিজম এবং কিছু কিছু ক্যানসার যেমন—গ্লুকাগোনোমাস। টেস্টোস্টেরনের অভাবেও মধুমেহ হতে পারে।

মধুমেহ প্রতিরোধের উপায় ঃ (1) সাধারণ স্বাস্থ্য তথা পুষ্টির মান বজায় রাখা। (2) খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করা। (3) নিয়মিত যোগাভ্যাস, ধ্যান, প্রাণায়াম, নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম, সাঁতারকাটা, হাঁটা। (4) জীবনশৈলীর পরিবর্তন ঘটানো এবং নিয়মিত বিনোদনমূলক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ। (5) মানসিক চাপ হ্রাস করার জন্য শিথিলকারক কর্মসূচি, যেমন—ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি অনুশীলন।

Scanned with CamScanner